কালপেঁচা

নলিনী বেরা

বাবার অবর্তমানে জমিজমা তদারকি কাজ করতেন আমাদের মেজোকাকা। রাতভিত হুট্ বলতে চলে যেতেন বিলে-বাতানে। কাটা আলের উপর ঝুপ্ ঝুপ্ মাটি ফেলে অহেতুক বহে যাওয়া জল আটকাতেন আর নয়তো মাটি কুপিয়ে আল কেটে অনাবশ্যক জল বের করে দিতেন জমি থেকে। সেবার শ্রাবণমাসে ঘন ঘন বৃষ্টিপাতের দরুম নদীর জল ঠেসে এল করণতলার বিল অবধি। জলকলস ধানের চারাগুলো সেই সবে পোঁতা হয়েছিল করণতলার জমিতে, তখনও গোড়াই ধরেনি ঠিকমতো। মেজোকাকা পড়ে গেলেন মহাচিন্তায়– সর্বনাশা নদীই না চারাগুলোকে নিয়ে যায় টেনে-হিঁচড়ে। শুরু হল নদী-মানুষে টানাটানি। শেষমেষ এক রাত্তিরে চারাগুলোকে সুস্থ দেখে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরেছিলেন আমাদের মেজোকাকা। মাঠজুড়ে তখন খলবলে জ্যোৎস্না, পৃথ্বীনাথের বাড়ির ওদিকটায় একটু যা আঁধার-আঁধার। দশাসই আমাদের মেজোকাকা বাহির-উঠোনের কলসী গড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কাদা পা ধুলেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে দেখলেন– কী যেন বসে আছে আমাদের মূর্ধুনে! কী যেন! হতে পারে সে কালো বিড়াল, ইঁদুরের সন্ধানে ঘাপটি মেরে বসে আছে খড়ো ঘরের চালে উঠে। ভালো করে মেজোকাকা দেখলেন– উঁহু, চুহামারনেউলী বিল্লী তো এ নয়। সে কোনো পশুই নয়, পক্ষী হতে পারে। কবুতর কি? কবুতর এই রাতভিত, জোড় ভেঙে একা একা ঘরের টুইয়ে উঠে বসে থাকবে? মাথা খারাপ! মনের ভ্রম ভাঙতে আমাদের মেজোকাকা দু-হাতে তালি বাজালেন। ''ট্র্যা-ট্র্যাঁ'' করে পাখিটা ধেয়ে এল কাকার মাথার কাছে। যেন ভালো মতো দর্শন দিতেই এক চক্কর ঘুরে গিয়ে ফের ঝাঁকিয়ে বসল ঘরের মূর্ধুনে। ধক করে উঠল আমাদের মেজোকাকার বুকটা– ''এ যে দেখছি কালপেঁচা রে বাবা!'' আতঙ্কে, হতাশায় দশাসই মানুষটা আর হাততালি নয়– এবার একটা আস্ত ঢিল ছুঁড়ে মারলেন সজোরে। মারলে কি হবে– ফের যে কে সেই। উড়ে উঠল বটে পাখিটা, কিন্তু পুনরায় সেঁটে বসল। তখন নিরুপায় একগুঁয়ে আমাদের মেজোকাকা দু-চোখ বুজে কোথায় পাখি কী দেখতে নেই, ঢিল ছুঁড়ে মারলেন মুর্হুমুহু। ধুরন্ধর কালপেঁচা উঠে গেল কি ঠায় বসে থাকলো–সে জানার আর দরকার নেই। ঘরে ঢুকে আমাদের মেজোকাকা একবস্ত্রে বিছানায় শুয়ে পড়লেন, চুপচাপ।

সকাল হলে তাঁর বুক ব্যাথা শুরু হল। আমাদের বাড়ির সবাই প্রথমে বড়রা তারপর ছোটরা, তাঁর খাটিয়ার চারধারে জড়ো হল একে একে। কাকা প্রথমে ভাঙলেন না, উপর কুলহির ভূষণ জেঠুর চাপে পড়ে অবশেষে কবুল করলেন। –''কী তুই ঠিক দেখেছিস অরুণ? পাখিটা বসেছিল না ওই তোর বসব - বসব?'' না বসার কথাটা বলতে পারলে মেজোকাকাও বোধ করি স্বস্তি পান। আমতা আমতা করে তিনি বললেন– ''মনে তো হয় বসেছিল।'' টুস্‌কি মেরে হেসে উঠলেন ভুবন জেঠু– ''হা-হা-হা- আঃ, ওইটেই জানা আমার উদ্দেশ্য। তাই বল– তোর মনে হয়েছিল অরুণ। রাতভিত দূর থেকে দেখলে ওরকম কত কিছুই তো মনে হয়। বাইরে গিয়ে একবার দ্যাখ্ তো জরিলার–চালের টুইয়ের একদিককার মুর্ধুন একটু উঁচু কী না!'' জরিলাল গুলির বেগে দৌড়ুল। ইত্যবসরে মেজোকাকা কথা আঁচ করে বেশ জোর দিয়েই বললেন– ''ওসব মূর্ধুন-টুর্ধুন নয় ভুবনদা, আমি কালপেঁচাই দেখেছি। আমার অত ভুল হয় না।'' একটু বলার পর আমাদের মেজোকাকা হেঁচকি তুললেন। তোলামাত্র একজন জল এনে দিল একঘটি। ঢক ঢক করে বেশ কিছুটা জল খেয়ে বেশটি করে চিনে গেল আমাকে! এখন অলক্ষ্যে থেকে কী ক্ষতি করে– সেইটে দেখার।'' ভুবন জ্যেঠুর কেমন যেন বিশ্বাস হয় না, উশখুশ করে বললেন, ''কালপেঁটা না লক্ষ্মী পেঁচা?'' আমরা একযোগে ঝুঁকে পড়লাম মেজোকাকার মুখের দিকে। বলা বাহুল্য, মনে মনে হিসাব করছিলাম বৈ কী– লক্ষ্মীপেঁচা হয় যদি তো শুভ আর কালপেঁচা হয় যদি তো অশুভ। আহা, মেজোকাকা, লক্ষ্মীপেঁচার নামটাই করুন না! খানিক চুপ থেকে আমাদের মেজোকাকা পুনরায় বললেন, ''আগেও বলেছি আবারও বলছি– কালপেঁচা, কালপেঁচা। ও জানোয়ার কালছাড়া অন্য কিছু নয়, ভুবনদা।'' ভুবন জেঠু এবার মাথার উপর সবেগে হাত তুলে ঘোষনা করলেন– তবে তো একটা কিছু 'দোষ' ঘটেছে, অরুণ। দৌড়ে দক্ষিণদাঁড়িয়া একবার যা তো বিজু–

বিজু মানে বিজয়চন্দ্র– তার মানে আমাদের ছোটকাকা। ছোটকাকা দৌড়ুলেন দক্ষিণদাঁড়িয়া 'ভাস' দেখাতে। এবেলা ফিরলেন না, নাকি খড়ি পেতে গণনা করতেই ভাসের সময় লেগে গেল অনেকটা, বড় জটিল গণনা তো! ওবেলা ফিরলে ছোটকাকাকে চারধার থেকে ঘিরে ধরলাম আমরা, বড়রাও জড়ো হলেন মুখ তুঁবো করে একে একে। স্নানাহার বন্ধ ঝোড়ো কাকের মতো ছোটকাকার সে কী দুরবস্থা! আমাদের গ্রাহ্য করলেন না মোটেও– যতক্ষণ বাড়ির মাথা মেজোকাকা না আসেন। তিনি এলে সবশেষে ছোটকাকা মুখ খুললেন, মুখ খুললেন কি একেবারে নাবালকের মতোই কেঁদে ফেললেন– ''মেজদা, আমাদের নাকি পুস্করা দোষ ঘটেছে! –পুস্করা হলে গৃহস্বামীর সমূহ বিপদ, দক্ষিণ দাঁড়িয়ার 'ভাস' খড়ি দেখে তাই তো–।'' ছোটকাকার কথার মাঝখানে আমাদের মেজোকাকা বললেন, ''সে জানি রে জানি, আর তোকে বলতে হবে না। কাল যখন থেকে ওই কালকে দেখেছি আমার সর্বনাশ বুক ব্যাথারও শুরু সেই থেকে।'' একথায় আমরা সকলেই বড়ো মনোকষ্ট পেলাম, ভারী দুঃখ হল আমাদের। মেজোকাকী তো ঝুঁকে পড়ে কাকার বুকে-পিঠে রীতিমতো শুরু করে দিলেন মালিশ। ছোটকাকা দুর্মুখের মতো বলে চললেন, ''জীবনহানিও হতে পারে। অবশ্য প্রথম কোপটা যাবে ঘরের পশুপাখিদের উপর দিয়ে–।'' আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম–যাক্ অনন্ত প্রথম কিস্তিতে আমরা তো মরছি না। লুকলুকানি খেলা ফেলে ছোটকাকা আসামাত্র ছুটে এসেছিলাম আমরা, চোখ ঠেরে কঁইকে বললা, ''চ ফের পুকলুকানি খেলি। আগে একে একে গোরুবাছুর-মোষগুলো মরুক, আমাদের পালা আসতে এখনো তো দেরি আছে বহুত!'' আমরা সদলবলে–কই-গুঁজরী-গাঙন লুলা আর হাড়িরাম নিশ্চিন্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি আর মেজোকাকা তড়পে উঠলেন, ''দক্ষিণ -দাঁড়িয়ার ভাস পুষ্করার প্রতিবিধান কী দিল– আগে সেইটে বলে ফ্যাল্ ম্যাড়া!'' আমরা যে যার পুনরায় বসে পড়লাম ঝপ্ করে। আমাদের বিজুকাকা ফর্ ফর্ করে ইয়া লম্বা একটা ফর্দ মেলে ধরলেন– ''স্বস্ত্যয়ন করতে হবে, যাগযজ্ঞ, একশো আটটা পদ্ম আর সাড়ে ন সের ঘৃতাহুতি–।'' ''হুঁ, ফদ্দ তো বিশাল, যাগযজ্ঞ কি মুখের কথা? তার জন্য টাকা চাই, টাকা–লে আও রূপিয়া!'' আমরা দেখলাম আমাদের মেজোকাকার চোখের চামড়া কুঁচকে গেল মুহূর্তে, চোখের দুদিকে ভাঁজ পড়ল তিনটেরও বেশি, হাতের আঙুলগুলো দাগিদার ভঙিতে নড়তে লাগল অনবরত। ''লে আও রূপিয়া''

''লে আও রূপিয়া'' –লে আও তো বটে, কিন্তু আনে কে? আমাদের অপরাপর কাকাদের মাথা হেঁট, তাঁরা থোতনা নিচু করে মাটিতে কাঠিখুঁচি বুলিয়ে কাটতে লাগলেন এঁচড়-বেঁচড়। জলের মতো কথাটার মানে বুঝলেও তাঁদের এর বেশি করার কিছু ছিল না। নিরুপায়, নি-মুরেত্রাদ। তবে বলতেই হবে– কাকীদের মধ্যে আমার ন-কাকীই সেরা। তিনি গড় গড় করে পড়তে পারেন 'রামায়ণ', 'সুবৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র'। একহাত ঘোমটার আড়ালে তিনি শ্বশুর - ভাসুরদের মুখের উপর বলতেও পারেন পুট্ পুট্ করে। মকদ্দমার শমন এলে নানাবিধ পুলটিশ -মারা কথায় তিনি তাঁদের খেদান। পিছু হাটতে হাটতে শমন-দুশমনরা ঘাড় ঘুরিয়ে বড়জোর বলেন– ''মেয়েটা তো আচ্ছা, বউটা তো বেশ, মহিলা তো ডাঁহা তর্কবাজ হে মুচুকুন্দ!'' আমাদের মেজোকাকার 'লে আও রূপিয়া''র হুঙ্কারে আমাদের ন-কাকী ডর পেলেন না একটুও, সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘোমটার আড়ালে পুট পুট করে বলে ফেললেন, ''আতান্তরে পড়েছি যখন, উপায় একটা দেখতে হবে বৈ কী। গ্রহের ফের, ছেলে-পুলে নিয়ে সংসার করি, হাত-পা গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে তো পারি না আর! আমরা সবাইু মিলে চেষ্টাচরিত্র করি যদি তো–।'' কথাটা পুঙে নিলেন আমাদের মেজোকাকা, বললেন, ''ওই বই, বউমাই বলেছে ঠিক, যথার্থ!'' সভা ভঙ্গ হল, হাত-পা ঝেড়ে ধুলো ঝেড়ে আমাদের গোটা পরিবারটাই উঠে দাঁড়াল খাড়া হয়ে। শুধু যা আমাদের ঠাকুরমা, ষাঁসড়াগ্রামের ডাকসাইটে অঞ্জনা সুন্দরী, তার সম্বল লাঠিগাছটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তাও খুঁজে দিল গাঙান। বলল, ''এই কী না?'' গাঙানকে, লাঠিগাছটাকে আঁকড়ে ধরে চুম্বন করে আমাদের ঠাকুরমা বললেন, ''বেঁচে থাক বাছা!''

দুই

বিকালবেলা বাড়ির উঠোন সংলগ্ন আস্তাকুঁড়ে এটা-সেটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমাদের ন-কাকার ছেলে গাঙান বিরক্ত হয়ে বলল, ''ঠাকুমার তো কথার কোনো মানেই হয় না, আমরা তো আর প্রথমে মরছি না! আগে তো গোরু ছাগল-মোষেদের পালা, নয় কী না ললিনদী?'' বুড়ির ''বেঁচে থাকা বাছা'' কথাটায় ভাঙানের বোধকরি ভয় ধরেছিল খুব। চারধারে যখন একঘেঁয়ে 'মরা' তখন 'বাঁচা'র এতটুকু কথা বলা মানেই মরার ভাবনাটাকে আরেকটু উসকে দেয়া। –ভিতরে ভিতরে গুমরে একসা হয়ে যাচ্ছিল গাঙান। তাকে অভয় দিয়ে বলি, ''তুই থাম তো গাঙান, পুস্করা আমাদের এই ঘেঁচু করবে, কাঁচকলা।'' বললাম বটে, কিন্তু আস্তাকুঁড়ে একটা মরচেধরা ভাঙা হাতিয়ার দিয়েও যদি পুস্করাকে রুখা যায়! কোথাও একটুকরো চিক্‌চিক কাগজ, খড়্‌খড়ে রাঙতায় মোড়ক, দেশলাইয়ের খোল, জালের কাঁঠি–পাই যদি তো জমা করে রাখছি সযত্নে। আমাদের অধর্মের অধম গুজরীও একদিন কুড়িয়ে পেল 'সিদ্ধেশরী কটন মিলের' ছাপ-মারা টিকলি একটা– সেই নিয়ে কত ঝগড়া! তার টিকলি গুজরী আর কাউকে দিতে চায় ন্যা, তার কাছে ঐ টিকলিটাই রক্ষাকবচ কী না! এই করে আমরা যখন পুস্করার বিরুদ্ধে যে যার অস্ত্র সংগ্রহে ভারী ব্যস্ত, বাড়ির অপরাপর লোকজন তখন উঠে পড়ে লেগেছে যে যার অর্থসংগ্রহে। কোথাও একটা টাকার গাছ কিংবা কল্পতরুর ঝাড় নেই যে আমাদের কাকীমারা দৌড়ে গিয়ে কোঁচড় ভরে তুলে আনবে। অতএব সন্ধে হল তো যে যেখানে দুপ্‌ধুপ্ বসে পড়ল মিটিঙে। ওই বসাই সার, আমাদের ঝাঁকড়া দশাসই মেজোকাকা ''কাঁহা রূপিয়া'' ''ছোড়ো রুপিয়া'' বলেই হাঁকাড় দিলে সেজ-ন'-ছোট সব বাবুরাই পিঁপড়ের গর্তের ভিতর সেঁধোতে চান। কেউ কেউ নিশ্চুপ বসে পায়ের চাপড়ায় লটকে থাকা মাঠঘাটের শুকনো কাদা নখে খুঁটে ছাড়ান। দু-চোখ বুঝে প্রথম প্রথম যিনি হাই তুলছিলেন দু-দশ মিনিট বাদে বাদেই– এখন তো তিনি একেবারেই ঢলে পড়লেন ঘুমে! মা থেকে আমাদের ছোটকাকী ইস্তক গা টিপে দিয়ে, রামচিমটি কেটে, নিতান্ত ঠেলেগুঁজে ন-কাকীকে এগিয়ে দিয়েছিলেন যতটা, ন'কাকী ততটাই পিছিয়ে এসে দাঁতে আঁচল চেপে বললেন, ''আমি আর কত বলব দিদি? ঘরের পুরুষরাই যখন বসে আছে মেনীমুখো বাঁদর সেজে!'' এককথায় সত্যিসত্যিই আমাদের অধস্তন কাকারা তাদের পিছনটা ব্যস্ত হয়ে হাঁতড়ে দেখলেন। প্রশ্ন হতে পারে– পিছনে ল্যাজ আছে কি নেই তার পরীক্ষা করলেন? আরে ছো ছো, তাঁরা তাঁদের পাশ্চাৎ-দেশ হাঁতড়ে দেখলেন–সে হয়তো অন্য কারণ। অবশেষে মা-কাকীরা তাঁদের ন-ভাজকে ঠেলে দিয়েছিলেন যে পর্যন্ত, যতটা পথ, বলতে হবে আমাদের ন-কাকী আচমকা তার থেকেও দু-একপদ বেশিই অগ্রসর হয়ে অকপটে বললেন, ''ঠেলায় পড়লে সেই বলে না–চাচা আপন প্রাণ বাঁচা–গ্রহের ফেরে যখন একবার পড়েছি স্বস্ত্যয়ন না করে বা উপায়ন্তর কি? টাকা পয়সা–সে জোগাড়যন্ত্র হোক ছাই না হোক–দরকারে দু-দশকাঠা জমি–''

তিন

আমাদের তেমন জমি আর কোথায় যে অকাতরে দু-পাঁচ কাঠা বিক্রি বা বন্দকী কোবলা করে চড়াসুদে যাগযজ্ঞের টাকা জোগাড় হয়ে যায়। ওই তো দেহদিকে এক বিঘে সাড়ে তিনকাঠা, দখিনসোলের মাথায় ন কাঠা ছ ছটাক, পুরানডিহিতে উটবন্দী খাস বিঘে পাঁচেক, পাড়িয়ার শালিজমি এক লপ্তে এক একর তেইশ ডিসমিল, তা ভিন্ন মাথার মনি কুমারডুবির দলাজমি, ওহো, মনে করতেই ভুলে গেছি একদম– নদীর ধারে পাকুড়তলে আমাদের পালজমিও আছে কতক। তবে সেও তো প্রায় - নদীগর্ভে বিলীয়মান, একশেষ। একটু একটু ধসে যাচ্ছে প্রতিবছর। ধসা-হাজা জমি না হয় আছে মোটের উপর, কিন্তু অসময়ের অভাবের আষাঢ়-শ্রাবণমাসে সে জমি কিনবে কে? খদ্দের কই? আমাদের কাকারা আড়ে আড়ে কানখাড়া করে ঘুরে বেড়ান, তক্কে তক্কে থাকেন, অতর্কিতে খদ্দের পায় যদি তো পাকড়াও করে ধরে আনেন– এই মতলব। আমার জানা এক কাকাতো খদ্দের ধরার নাম করে গ্রাম থেকে আধমাইলটাক দূরে লোকহীন জনহীন ফাঁকা ফৈ-ফিক্কির ইস্কুলঘরের কাঠবেঞ্চিতে শুয়ে নির্ধুমসে ঘুমিয়ে এলেন এক-দুপ্রহর। আরে বাবা, জমি কি আর আলু-কুমড়ো-পটল, কিংবা গোরু-ভেড়া-ছাগলের মতো গৃহপালিত উৎপাদিত ফসল মনে করেছ– যে গ্রামের মুড়ো থেকে ডোরাকাটা গামছা কাঁধে গলায় তাবিজঅলা পাইকার ধরে এনে গছিয়ে দিলেই হল? উঁ-হু উঁ-হু, অত সহজ সে নয়। বরঞ্চ জমি হল কনে দেখার কনে, অধরা, লাজবতী, থর থর প্রথম প্রথম। যেমন মহীষদের দিদি-টিদি আর কি, কনে দেখতে আসা পাত্রপক্ষের কাছে বসছে তো বসছে, যোগাযোগ আর হয়ে উঠলে না। হাঁ-আ-আঃ সঠিক কথা হল ওই যোগাযোগ, জোত -জমি-যোগাযোগ–তা

না হলে কথা কী? ''চার ভাই তার থাপার থুপুর, চার ভাই তার ঘৃত মধুর*—থাপার থুপুর চার ভাই যখন একেবারে ধ্বস্ত, অসফল, এক ঝুঁজকো সাঁঝবেলায় যখন গোরুমোষগুলো গোহালে ঢুকছে হুড়দুর করে, তল্লাটের নামজাদা কোবরেজ আমাদের মেজোকাকা ভুরু কুঁচকে দেখতে পেলেন— হালে বাঁয়া তাগড়াই মোষটা তার ডান পায়ে একটুক খোঁড়াচ্ছে না? —''আলবাৎ খোঁড়াচ্ছে!'' বিড়বিড় করে বলতে বলতে শেষটায় চিৎকার করে উঠলেন— ''কাহা জরিলাল? এই যে উল্লুক—ইধার আও। অবলা জন্তুটার পায়ে পাঁচন দিয়ে এত করে মেরেছিস কেন রে, হারামজাদা? বেশ বেশ, নাই যদি মেরে থাকিস তো বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু খুব যে খোঁড়াচ্ছে রে! ধর তো দেখি!'' চার পা-অলা একজন্তুর কাছে এখন দু-পাঅলা দু-দুটো মানুষ এবং বিষয়টাও পা-সংক্রান্ত। আমাদের চরানে -বাগাল জরিলাল খঞ্জ মোঘটার পিছনে দক্ষিণপদ মেলে ধরে দেখাল আমাদের মেজোকাকাকে। অতবড় কালাপাহাড় জন্তু কি ওই একফোঁটকা ছেলের কাছে এত সহজে ধরা দেয়। ঘোড়ার মতো জোড়া পায়ে চাঁট লাগালে না? কিন্তু আমাদের জবিলালের হাতের মুঠোয় ছেড়ে দিয়ে ঘাড় লম্বিত করল। ফুটফুটে সাদা, কিঞ্চিৎ নীলাভ নয়নতারা, সরু সুতোর মতো লাল বর্ডার দেয়া চোখে অবিরল জলধারা, নয়নের লোর। তা কেতুর মাখামাখি। দেখলেই আড়াই-আ হয়, আর সে - রোগ তো দেখি, জরিলাল!'' বর্ষাকালে সচরাচর গোরুমোষের আড়াই-আ হয়, আর সে-রোগ হলে জীবগুলো খুঁড়িয়ে হাঁটেও, আহার বিহারে রুচির ব্যতয় হয়, অরুচি ধরে। কোল-ভুষি ঘাস খড় সে যত সুখাদ্যই মুখের সামনে ধরা হোক না কেন, খাদ্য ছেড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে পড়ে পড়ে হাঁপায়।—''উ'-হু, আড়াই-আ তো নয়!'' চিন্তিত সবেরে মেজোকাকা বললেন, ''আচ্ছা, টিপে দ্যাখ তো জরিলাল, ক্ষতটুকু চিপলে বজ্ বজই করছে কি? কিন্তু বললি তাও না? তবে তো 'বজবজীও নয় আনাড়-আ নয়, আর কি হতে পারে?'

মানুষের অসুখ-বিসুখে যেমন আমাদের মেজোকাকা, তেমনি গোরু-মোষের অসুখ-বিসুখে আমাদের গ্রামের জটাধারী কালিকা। কালিকা কোব্‌বেজ এসে গেলে আর কোনো চিন্তার কারণ থাকল না, খালি যা জরিলালের সুরুক কান্না বাড়তে লাগল উত্তরোত্তর। কালিকাচরণ প্রথমে এক বোতল মহুয়া মদ উনুন জ্বালাবার 'ফুঁকনলি' দিয়ে মোষটার গলায় ঢেলে খালি বোতলটা জরিলালের সামনে ধরে তামাশা করলেন— ''চুপ কর আর নয়তো ঠুসে দিব গলায় ভিতর। অনবরত খালি প্যাঁ-প্যাঁ!'' কালিকা কোবরেজ যতই তামাশা আর কেরামতি দেকান, অসুস্থ মোষটার অবস্থার উন্নতি ঘটল না একফোঁটাও। সে যতই ফেল মারে, ধু-ধু রাত যতই বর্ধিত হয়, মোষটার অবস্থার যতই অবনতি ঘটে— আমাদের মা-কাকীদের চিন্তা তত বাড়ে! তাঁরা একে একে ঘর ছেড়ে গোহালঘরের দরজায় এসে ধুবু হয়ে বসেন, হয়তো কোল ঘেঁসে বসা বাচ্চাটার ন্যাড়া মাথায় অযথা হাদ বুলান, থাপা দেন, জ্বলন্ত আগুন থেকে একটুকরো আগুনের 'ফুড়গুলি' ঠিকরে ছিটকে ওঠার মতো চমকে ওঠেন মাঝে মাঝে। আমরা ছোটরা বড়জোর ভয়াতুর চোখে এক মূর্ধুন থেকে আরেক মূর্ধুন এক বাঁশে কূল না পাওয়া বাড়িটার অন্ধকার অভ্যন্তরে চেয়ে চেয়ে দেখি। যে যার সে তার চুপচাপ। খালি যা জরিলালের একটানা সুরুক সুরুক কান্না, বোধ করি আস্ত একটা কান্নার ফিতা-ই হবে, আমাদেরও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আছড়াতে লাগল মুর্হুমুহু।

মোষটাও নিস্তার পেল না, ভোর না হতেই ''অঁয়-অঁয়'' আর্তনাদ করে একসময় মরে গেল পুট করে। আমরা যে যার ঘরের ভিতর ঢুকে খিল এঁটে দিলাম দরজায়, শুধু যা জরিলাল একলা পড়ে থাকল গোহালঘরে, মৃত মোষটার গায়ের উপর সে পড়ে পড়ে আছাড়ি-বিছড়ি কাঁদতে লাগল। বস্তুত সে আমাদের কেউ না, না কোনো আত্মীয় - স্বজন ভাইবেরাদর, কেউই না, ভাত-কাপড়ের বিনিময়ে সম্বৎসর থাকা সে আমাদের মুনিষ, তার অত পুস্করার ডর ভয় কী? তত্রাচ আমাদের ঠাকুরমা মাঝের ঘরে খুব সাবধানে নিজের পা জোড়া খাটিয়ার উপর নিরাপদে তুলে হাঁকতে লাগলেন— ''ওরে ড্যাকরা-ছোঁড়া, উঠে আয় বাপ, যে গেছে সে গেছেই তুই তো জিন্দা মানুষ মড়া আগলে তুই কেন বসে থাকবি? উঠে আয় ধন—।'' জরিলাল উঠল না, সকালে ভাগাড় থেকে কাকারা ফিরে এসে মা-কাকীরা তাঁদের টেনে বসালেন মিটিঙে— ''যা হোক এবার একটা কিছু কর, আর তো চারা নেই!'' সব শুনে আমাদের মেজোকাকা, যাঁর ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়ানো চুল আর সাঁড়াশির মতো হাতের আঙুল, হাঁটু মুড়ে বসে ভাঁজ করা হাতের খাঁচায় মাথাটুকু গুঁজে কোনোমতে বললেন, ''হাম কুছ নেহি জানতা।'' আমাদের ন কাকী যিনি কী না হিন্দির 'হ' জানেন না, অত সহজে ছাড়নেবালী কি, যেমন-তেমন হিন্দিতেই ঠেসে ধরলেন, ''তবে কৌন জানতা?'' বোধকরি এতদূর আশা করেননি মেজোকাকা, কোনঠাসা হয়ে পিট পিট করে একমুহূর্তে চেয়ে দেখলেন। পরক্ষণেই বললেন, ''ওই ম্যাড়াদের আগে শুধোও বউমা।'' আমরা ভেবেছিলাম, বেশ একটু ঠোকাঠুকি হবে, হিন্দিতে হিন্দিতে। বাতচিত হবে। ''হিঁয়া করেঙ্গা উঁহা করেঙ্গা'' —এই সব হবে টবে। তা নয় আমাদের মেজোকাকার গলার স্বর কেমন কেঁপে গেল না? কেমন ধরা লাগল না? চড় চড় করে রোদ বেড়ে উঠছিল, কাকাদের কচ্ছপের মতো খোলা পিঠের উপর তার চাকা চাকা দাগ। তাঁর মাথা হেঁট করে বসেছিলেন—যেন তাঁদের সমুখে অনন্ত দুঃখের পারাবার। একে একে বড়রা রোজগারের ধান্দায় যে যার উঠে গেলেন আমরা ছোটরা দুঃখটুঃখ দেখে গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলাম।

বিঝলদের উপর গাঙানের ভযানক রাগ, সে বলল, ''পেঁচাটা আমাদের চালে না বসে বিঝলদের টুয়ে বসলে বেশ হত!'' আমাদের কঁই আরেক কাঠি সরেস, সে যুক্তি আঁটল— ''আজ থেকে রাত ভিত জেগে থাকব, নিশাচর কালপেঁচা উড়ে আসে যদি তো হাততালি মেরে হুস্ হুস্ করে খেদিয়ে দেব পানকিস্টোদের বাড়ির ওদিকে।'' পানকিস্টোর সঙ্গে কঁইয়ের আবার একদম পটে না কী না! আমাদের পুষ্করা-পড়া ভিটেয় আত্মীয়-কুটুম্ব আসা বন্ধ হয়ে গেল একেবারে, পাড়া প্রতিবেশী যাও-বা এক-আধজন আসেন, ওই বড়জোর নাচদুয়ারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়েন—''অরুণ রে!'' হয়তো দরকারি জিনিসটা এই বলে চেয়ে নেন— ''সেই এনেছিলি সরু বাঁটের কোদালটা, এখন দে তো অরুণ!'' হয়তো দরকারি কথাটা পাড়াসুদ্ধ লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন— ''গেল হাটবার তার আগের হাটবারে যে টাকাটা ধার নিয়েছিল বিজু, আমার বড় দরকার হয়ে পড়েছে— আজ দিতে পারবি?'' বড়রা যেমন তেমন, ছোটরাও খেলতে আসে না, কে যেন তাদের মানা করে দেয়। বাহির হতে আমরাও পারি না বড় একটা, নাইতে গিয়ে দূরের পুকুরে - খালে - নদীতে টাটকা টাটকি মরে পড়ে থাকব—সেই ভয়ে কোথাও নাইতে যাওয়া আমাদেরও বারণ। মা-কাকীমারা বড়জোর উঠোনের কলসী গড়িয়ে, দু-এক বালতি জল এনে জল ঢেলে মাথায় থেপে থেপে করিয়ে দেন কাক - স্নান। বিকালবেলা কাছের রাস্তায় মাটেঘাটে খেলা একটু - আধটু সুযোগ আসে—পাড়াপ্রতিবেশীদের ছেলে পানকিস্টো-বিঝিল-মহীধরদের

দৌরাত্ম্যে মাঠে মারা যায় তার সবটুকু। প্রথম প্রথম বিঝল-মহীধররা আমাদের ঘিরে ধরে, তারপর গা টিপে গলা টিপে টিপে হয়তো অনুমান করে– আমরা করে মরব। রাত হলে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক জটিল হয়ে যায়, হাঁস-মুরগীর ছানার মতো আমাদেরও খোঁড়লে পুরে অর্গল বন্ধ করে দেয় মা-কাকীরা। আমরা যে যার ঘরের ভিতর দড়ি খাটিয়ার উপর পা তুলে বসি, ধাড়ী মুরগীটা এমন কী না তার ডানার নিচে পেটতলে কাঁড়াল-কোঁড়ল বাচ্চাগুলেকে সাপটে আগলে রাখে– আমাদের মা-কাকীরাও তেমন আড়াল করে বসে থাকেন। তখন একঘর থেকে অরেক ঘরে অন্ধকারে একলা একলা যাওয়া প্রায় নিষেধ, কখনো রাতভিত আমাদের 'ছোট - বাইরে' (হিসি) পেলে মা - কাকীরা গুঁজে ধরেন গাড়ু! সকালে নোঁরা গাড়ুগুলো আমরাই ধুয়ে-টুয়ে সাফা করি।

আমাদের গোহালঘরের চারধারে দরমার বেড়া, তার ওধারে একটা নাবালক পেঁপে গাছ। তার ওধারে হীরালালদের হেঁতুধানের খড়গাদা। মধ্যের গলিটুকু সচরাচর লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাজিত গুপ্ত এক ধরিত্রী! ওইখানে দাঁড়িয়ে ভোর ভোর আমাদের তাগড়া দশাসই মেজোকাকা গোহাল ঘরের চাল ফেড়ে মোটা থুম্বা একটা বোতল বের করে প্লাস্টিকের চামচে দুধ-সাদা-ঘন বুক ব্যাথার দাওয়াই ঢেলে চুকচুক করে খান। এসময় তাঁর জিভ হয়ে পড়ে লম্বিত, জিভের ডগাটুকু টিকটিকির ল্যাজের মতো নড়ে নেই। কেমন করে প্লাস্টিকের চামক থেকে মৃতসঞ্জীবনী সুধার শেষ বিন্দুটুকু মরণশীল মানুষের জিভের ডগায় পড়ে লাঞ্ছিত হতে হতে–দরমার ফাঁক দিয়ে লোভাতুর চোখ মেলে তাই দেখি। চেটেপুটে খেয়ে ঝটিতে ওষুধের বোতল পুনরায় খড়ের চালে সর্ন্তপণে গুঁজে রেখে আমাদের মেজোকাকা অদৃশ্য হয়ে গেলে আমি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করি মাত্র। মাপা এক চামচ দুধসাদা-ঘন গলাধঃকরণ করে মনে মনে বলি– ''আঃ বেঁচে থাকার মর্মই আলাদা! এ দুনিয়ায় কোন্ হরিদাস না বেঁচে থাকতে চায়?''

চার

শ্রাবন গেল, ভাদ্রও গেল, আশ্বিনের শেষাশেষি আমার ন-কাকার ছেলে গাঙান পড়ল জ্বরে। চারধারে থরহরি কম্পমান! মা-কাকীদের হাতে দুধের বাটি গেল কেঁপে। খাবার পত্র হাতে ধরে আমাদের যত না খাওয়া হয় তার থেকে মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় বেশি। পড়ে পড়ে ভাঙতে লাগল কাচের গ্লাস, চিনামাটির ডিস–তুবড়াতে লাগল এনামেলের কানা-ভারী বাসন-কোসন। ঘরের ভিতর বিছানায় মোটেও শুয়ে থাকতে চায় না আমাদের ন-কাকার ছেলে গাঙান–সে ছুটে ছুটে বাইরে আসে। বাইরে খোলামেলা অনন্ত জীবন! সে তার দুঃসহ কষ্ট চেপে আমাদের সঙ্গে খেলতে খেলতে হাঁপায়, ধুঁকতে থাকে। আমাদের ন-কাকী ঝটপট এসে হাতের তালু পেতে তাপ নেন, বলেন– ''উঃ গা যে পুড়ে যাচ্ছে বাপ আমার! ঘেরতে বারণ করলেও শুনিস না!'' অতঃপর গাঙানকে কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দেন নান-কাকী, তারপর মুখ অবধি টেনে দেন চাদরটা। সে আবার কিছুতেই চাদরে মুখ ঢেকে শুতে চায় না কী না, দু-পায়ের পাতায় বিড়ালের থাবার মতো আঁচড়ে আঁচড়ে চাদরটা পায়ের কাছে জড়ো করে নেয় গাঙান। এসময় তার খাটিয়ার কাছে দাঁড়ালে জ্বরের ঘোরে সে আমাদের ফিস্‌ফিস্ করে বলে, ''মোটে একটা তো মোষ মারা গেছে সবে, এখনও গোরু আছে, ছাগল আছে, হাঁস-মুরগি বাকি পড়ে আছে অজস্র। আমাদের পালা আসতে ঢের ঢের দেরি এখনও তাই না ললিনদা?'' বললাম, ''হাঁ, তা তো বটেই, সেজন্য তুই চিন্তা করিস না গাঙান।''

তল্লাটের নামজাদা কোবরেজে আমাদের মেজোকাকার ওষুধেও জর কমছে না গাঙানের। দিনকতক বাদে সাইকেলের ক্যারিয়ারে কালো ওষুধের বাক্স চাপিয়ে গূঢ়াকেশ ডাক্তার বেল বাজাতে বাজাতে এসে গেলেন, নাড়ি টিপলেন, স্টেথো দিয়ে বুক দেখলেন, ওষুধ দিলেন, কিন্তু ভরসা দিতে পারলেন না, একটুও, অপারগ তিনি ফিরে গেলেন বিমর্ষ হয়ে হয়ে। অগত্যা ফের আমাদের মেজোকাকা। জড়িবটি, ঝাড়ফুঁক, টোটকা- মোটকা, ছাড়ান-নিমছাতেও কাজের কাজ কিচ্ছু হল না। শেষ অবধি কাঠবাক্স হাতে ভোলানাথ দন্ডপাটও হাজির। সবাই যখন একধারসে ফেল, তখন খামোকা একজনের পাশ করে কাজ দেখানো কেন– হোমিওপ্যাথ ভোলানাথ দন্ডপাটও ডাহা ফেল করলেন। কী ধারার অসুখ রে বাবা! জ্বর বাড়ে যদি তো কমতে চায় না মোটে, আর কমে যদি তো একেবারে কমে ঠান্ডা মেরে হাত-পা অসাড় হয়ে যায়! মা-কাকীরা খাবার দিতে এলে আমাদের গাঙন তাঁদের লতার মতো জড়াতে লাগল, জড়িয়ে ধরে ধরে বলতে লাগল– ''বল না গো, গোরু-বাছুরদের পালা শেষ হলে তবে তো আমাদের পালা? তবে তো? ঠিক কী না? গণৎকার তাই বলেছে কি না?'' আঁচলে মুখ চেপে আমাদের মা-কাকীরা ঠেলে - উঠে - আসা কান্না আটকাতে চান। কী পত্রারেন, বরঞ্চ সে আরেকটু উর্ধে উঠে চোখের তারা দুটো ফুটো করে দেয়– ফাটা চোখে জল ঝরতে থাকে অবিরল। আমরা কেউ তার খাটিযার ধারে কাছে গেলে গাঙন উৎফুল্ল হয়ে উঠে বসতে চায়। তাও কী পারে, আমরা তাকে ধরে বেঁধে ফের বিছানায় শুইয়ে দিলে সে কোনোমতে কষ্টেসিদ্ধে হাসে, বলে, ''এই জানিস তো, কইয়েব মা কিন্তু বলেছে– আমরা এখন-এখনই মরছি না! কেমন নিশ্চিন্ত নয়?''

তার-দু-চারদিনও কাটল না, একরাত্রে গাঙানের অসুখ বেড়ে দাঁড়াল দ্বিগুণ। রাত যত বাড়ে, জ্বরের মাত্রা তত বর্ধিত হয়। জ্বরের ঘোরে গাঙান কেবলই ধারাপাতের নামতার মতো মুখস্ত বলে যায়– ''মা মা, ভেবো না, আমি তো আর এক্ষুনি মরছি না মা, আগে তো একে একে গোরুবাছুর সব কটা যাক মা–।'' গাঙানের বিকার দেখে আমরা ভয়ানক শঙ্কিত হলাম, কাকী-কাকীমাদের ভিতর বেড়ে গেল অস্থিরতা। আর কী তমসাঘন রাত চারধারে! ভয়ে ভাবনায় আমরা এদিক-সেদিক করতে গিয়ে এর-তার ঘাড়ের উপর উপর্যুপরি পড়তে লাগলাম। পশ্চিমে হাঁটতে গিয়ে কারুর গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে দেখি– আমাদের মেজোকাকা দেয়ালে পিঠ পেতে রুম রুম দাঁড়িয়ে! দক্ষিণে হাঁটতে যাব আর দেখি কি না'কাকা হাঁটু মুড়ে বসে– কান্নাজড়িত, কম্পিত। উত্তরে পা চালিয়ে ছোটকাকার পিঠের উপর জোর আছাড় খেলাম– আমাদের মাটিতে পেটতাবুড় দিয়ে শুয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছেন! উত্তরে নেই দক্ষিণে নেই, উর্ধ্বে নেই অধেঃ- নেই, পশ্চিমটাও সিল করা মুখ আঁটা! নিরুপায় আমি এ সবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ''আঁ-আঁ'' করে বিকট কেঁদে উঠতেই মনে হল চারধার থেকে আরো অজস্র কান্না এসে মিলে মিশে একাকার। একমুহূর্তে তার মাত্রা বেড়ে হয়ে উঠল দ্বিগুণ- চৌগুণ-হাজারগুণ–কোটি কোটি গুণ! কোত্থেকে মা দৌড়ে এসে আমার হাত ধরে এসময় টেনে নিয়ে গেলেন

ঘরের ভিতর। এ সময়ই আমার ন-কাকার ছেলে গাঙান আমাদের ছেড়ে চলে গেল কিনা।

পাঁচ

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে সন্তানহারা গান্ধারী যেমন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন– ''এ দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী একমাত্র তুমি, তু-মি তেমনি আমাদের গাঙান হারা ন-কাকী পরের দিন চেপে ধরলেন আমাদের মেজোকাকাকে। আলুলায়িত কুন্তল, একটা হাত একটা আঙুল সামনে প্রসারিত, উদ্দিষ্ট–অবিকল গান্ধারীর ভঙ্গিমায় ন-কাকী একধারসে ঠুকে যাচ্ছেন, ঠুকে যাচ্ছেন। আমাদের মেজোকাকা হয়তো তড়বড় করে বলতে গিয়েছিলেন– ''হাম ক্যায়া করেগা বহুমা'' –এক্ষেত্রে হিন্দিবাত বলা উচিত হবে না ভেবে খুব জোর দমে গেলেন। পতিপ্রাণা গান্ধারী ক্রুদ্ধ হলে ত্রিলোক দগ্ধ করতে পারেন, তো আমাদের ন-কাকীর সামনে পড়ে শুধু শুধু ভস্মসাৎ হবে–সেই ভয়ে স্থানান্তরে গমন করলেন মেজোকাকা। আমরাও দড়ি ছেঁড়া গোরুর মতো এদিক- ওদিক ঘোরাঘুরি শুরু করে দিলাম, মা-কাকীরাও কেমন যেন 'ঢিলা' দিয়ে দিলেন আমাদের হঠাৎ হঠাৎ। বোধকরি তাঁদের ধারণাটা এই–একবার যখন মরতে শুরু করেছে তখন মরবেই মরবে, অনর্থক ঢাকাঢাকি দিয়ে লাভ কী? ছাড়া পেয়ে আমরাও যত্রতত্র অবস্থানে–কুস্তানে সুক্ষণে কুক্ষণে শিরদাঁড়া ঢিলে করে বেড়াতে লাগলাম, শমন এসে পিঠের মাঝবরাবর খাবলা মেরে নিয়ে যায় যদি তো যাক না!

একদিন তো আমি একা একা বহুদূর হেঁটে নদীতে সাপ-খোপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে ছটফটে একটা মাগুর দু-দুটো হ্যাঠা মাছ ধরে আনলাম! এইভাবে আমরা যখন মরার জন্য গা এলিয়ে পড়ে আছি একরকম, আমাদের কোনো গরজ নেই– তখন মেজোকাকা এক বিকালে কোত্থেকে ঘুরে এসে ঘোষণা করলেন–''কালবাদ পরশু'পুষ্করা যজ্ঞ' হবে, কুছ ইধার উধার নেহি শুনেগা–''। আমাদের আবার 'ইধার-উধার' কী? মরতে বসেছিলাম, কোনোমতে খাড়া হয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করলাম, হুটোপুটি! আমাদের চরানে–বাগাল জরিলাল একদিন পরামানিকের সঙ্গে গিয়ে হোমের জন্য গাদাগুচ্ছের শালকাঠ বয়ে আনল। সাইজ করা, একেকটা এক বিঘৎ লম্বা। তার উপর কাঠমিস্ত্রি নবীনের কাছ থেকে বার্‌শি এনে ছেঁচে-ছুলে জরিলাল এমন আচ্ছা সুন্দর বানিয়ে তুলল যে আমরা পরস্পর বলাবলি করাতে লাগলাম– ''এ দিয়ে বেশ 'ডান্ডাগুলি' খেলা যায়!'' আমাদের চোখের সামনে 'সান-রিলে' সাইকেল চালিয়ে বিজুকাকা ছুটে গেলেন একশো আটটা পদ্ম আনতে। পদ্ম? সে আবার কোথায় ফুটে রে বাবা, আমাদের চারধারে যে কটা মরা-হাজা পুকুর তাতে তো বড়জোর শালুক আর নয়তো কল্‌মী ফুলের চলাচলিৎ পদ্ম কোথায়? এতদিনে অবশ্য পড়েও ফেলেছি– ''কোথায় ফলে সোনার ফসল/ সোনার কমল ফোটেরে,/ সে আমাদের বাঙলা দেশ/ আমাদের বাঙলা রে'' হলও তাই বিফল মনোরথ হয়ে ছোটকাকা ফিরে এলেন। –''এ তোর সান-রিলে সাইকেলের কম্ম নয় বজু, যেতে হবে রেলে চড়ে পাঁশকুড়া।'' প্রতিবেশী কেউ একজন সলুক সন্ধান দিলেন। আমরা আরেকবার স্তম্ভিত হতচকিত হলাম– রেল? সে আবার কোথায়? শুনেছি বটে খড়গপুর নামের বৃহত্তর রেল-জংশনের কথা– সেখানে সস্তায় না কী ছোট-বড় রেলগাড়ি চড়া যায়! আমাদের ছোটকাকা গামছায় মুড়ি বেঁধে ভোর ভোর রওনাও হয়ে গেলেন, রাস্তায় নদী পড়বে, ক্ষুধাতেষ্টা পেলে নদীর জলে মুড়ি ভিজিয়ে খাবেন। হই-হই করে যজ্ঞের দিন ভোরবেলা গোনাগুনতি একশো আটটা পদ্ম নিয়ে তিনি হাজির, আমরা চারদিক থেকে ছোটকাকাকে ঘিরে ধরলাম– এর আগে আমাদের মোটেও পদ্মদর্শন হয়নি কী না! কী তার শোভাৎ কোনটা বা এখনও স্ফূটনোন্মুখ, কোনটা হাতে হাতেই ফুটে গেল, ফুল্ল কুসুমিত। কোনটার ব্রীড়াবনতা নিমীলিত পাপড়ি নিচয়, কোনটার বা শিশির দুষ্ট শতদল! আমরা যে হাতে ধরে টুস্‌কি মেরে একটু ঝেড়ে - পুঁছে দেখব, তার উপায় নেই– 'অপবিত্র পবিত্র বা' বলে বিজুকাকা জোর খেদা লাগালেন আমাদের। আমরা এক ছুটে গোবর লেপা উঠোন মধ্যে ঝুপ ঝুপ বসে পড়লাম। সেখানে নানারঙের গুঁড়ি দিয়ে আঁকা হচ্ছিল আলপনা–যজ্ঞকুন্ডের প্রেতচিত্র। টিকিধারী ব্রাহ্মণপুরোহিত ও তাঁর সহকারীরা বড় সাবধানে পা ফেলে পা তুলে এ-ঘর ও-ঘর ডিঙিয়ে তদারকি করছিলেন যজ্ঞের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম।

খেজুর পাতায় বোনা চাটাইয়ের উপর রসুইকারীর দল প্রকাণ্ড প্রকান্ড কুমড়া নিমেঘে ফালি করে কুচি কুচি কেটে তরকারীর যোগাড় করছিলেন, ফাঁকতালে মুঠো মুঠো পাকা কুমড়ার 'বীচি' ছেলেপুলে মারফত পাচার করে দিচ্ছিলেন যে যাঁর ঘরে। সে সব ভালো জাতের বীজ কী না, উদমা মাঠে ঘাটে পুঁতে দিলেও রদ্‌বদিয়ে গাছ! আমাদের গুজরী তাই দেখে পাকা মুরুব্বীর মতো চেপে ধরল, শুরু করে দিল ঘ্যানর ঘ্যানর– ''ছি ছি, কাজটা ভালো হচ্ছে কি! কাজের বাড়ি বলে কি যা খুশি তাই করবে না কী? ও মুচিরামজেঠা, কানে কম শুনছ– বলছি কি?'' মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গি করে মুচিরাম বললেন, ''অ্যাঁ? কী বলছিস মা? কই না তো। কখন থেকে বলে একমনে তরকারী কুটছি।'' তরকারী কুটায় অধিকতর ব্যস্ততা দেখালেন মুচিরাম, আমাদের গুজরীও নাছোড়– ''অতগুলো যে পাটিয়ে দিলেন লগেনের হাত দিয়ে– সে আমি দেখিনি মনে করেছ?'' হাত জোড় করে মুচিরাম বললেন, ''হাতজোড় করে বলছি, একবারের মতো নিয়েছি নিয়েছি আর হবে না, ক্ষেমা দে মা!'' বলেই অস্ফুটে বললেন, ''এক ফোঁটকা মেয়ের বচন কী, কী তার সহবত– এত মরল, পুষ্করায় মরল না কেন?'' গুজরী কি আমরা, মুখে যতই ফট্ ফট্ করি না কেন, ঘরের ভিতর এখনও ঘাপটি মেরে বসে আছে পুষ্করা। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সিদ্ধান্ত হল এই–''রাতটুকু সে থাকবে ঘরের ভিতর, রাত পোহালে, ভোর না হতেই সে হয়ে যাবে পগারপার, ত্রিসীমায় আর তার টিকিটিরও দেখা মিলবে না।'' একথায় উল্লসিত আমাদের মেজোকাকা খাড়া হয়ে বললেন, ''উ যে গেল তার কুছ পরমাণ মিলে গা?'' ''–জরুর!'' তেজস্বী ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাগের মাথায় বলে বসলেন, ''বর্হিগমনের পায়ের ছাপও পড়ে থাকবে–সে ছাপ স্বচক্ষে দেখতে পাবে, অরুণ।'' অতঃপর আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম কোথায় সরু সরু চিকনবালি পাওয়া যায় তার সন্ধান করতে। চিকনাবালির উপর পায়ের ছাপ সুস্পষ্ট পড়ে কী না। গঙ্গাধরদের বাঁশঝাড়ের কাছে - পিঠে ঝুরঝুরে বালি পাওয়া যায় এই রাতেই হেরিকেন হাতে আমাদের ছোটকাকা বাঁশতলা থেকে মাথায় করে বালি নিয়ে এলেন একঝুড়ি। আমাদের মা-কাকীরা গুঁড়ি-চালুনি দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে সে - বালিকে তুললেন একেবারে নিখাদ, নিষ্কলুষ। সুবিস্তৃত মূর্ধনালা বাড়িটায় যতঘুলো ঘর আছে, তার সবকটা দরজায় জানালার

তলদেশে বেশটি করে পাতা হল বালির কম্বল। এখন কেউ যদি ঘর ছেড়ে হেঁটে 'বাহিরে' যায়, তো তার পায়ের ছাপ অবিকল পড়ে থাকবে।

ছয়

সকাল সকাল খেয়ে দরজায় খিল এঁটে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই শুয়ে পড়লাম। শুলেই ঘুম কি আর আসে? উঃ কী কুহেলিকাময় অসহ্য রাত এ রাত ভোর যদি না হয়, আর ভোর হলেও পুষ্করা যদি না যায়, যাগযজ্ঞের কোনো না কোনো দোষত্রুটির কারণে সে যদি গাঁটি হয়ে বসে থাকি ঘরের ভিতর—তবেই তার বেলা হাত-পা ঠক ঠক করে, দাঁত-কপাটি লেগে যায়, খাটিযা থেকে নেমে পড়তেও ভয় হয়— যদি পুষ্করা তাদের বেরুনোর মুখে প্রাণে না মারুক লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ দুটোয় একটু গুঁতিয়ে দেয় শুধু? তবে তো হাড়গোড় ভেঙে একাকার হবে? কত কি আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘরের ভিতর আমরা জমা কয়েক প্রাণী একসময় আখাম্বা ঘুমে পড়লাম ঢলে। বাইরে, যজ্ঞকুন্ডের মাথায় একটা পেট্রোম্যাক্সের বাতি জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছিল। তার চারধারে ঝোপঝাড় থেকে কতক পোকা উড়ে এসে জুড়ে বসছিল। পোকাগুলো ততক্ষণ পুড়ল পেট্রোম্যাক্সটা যতক্ষণ জ্বলল। একসময় সূর্যের আলো এসে পড়ায় পেট্রোম্যাক্সের বাতিটুকু ম্লান হল। তদুপরি আমাদের মেজোকাকা ঘুম থেকে উঠেই পিন খুলে গোটা পেট্রোম্যাক্সটাই নিভিয়ে দিলেন। পোকাগুলো তো রেহাই পেল। তারপর, বাড়িসুদ্ধ সবাই জেগে উঠলে শুরু হল খোঁজাখুঁজি। যে যার ঘরের দরজায় জানলায় উবু হয়ে বসে পড়লেন, চোখ বড় বড় করে দেখলেন— যেমনকারি বালি পড়ে আছে তেমন। শুধু যা আমাদের ঘরের দরজায় পাতা বালির কম্বলের উপর গোটা তিন পায়ের ছাপ উঁ-হু, সে কোনো মানুষের নয়। একেবারে ছোট্ট, এতটুকু মুরগীর বাচ্চা বালির উপর হেঁটে গেলে যেমন বড়জোর তার তিন আঙুলের ছাপ পড়ে যায়—হুবহু ওই রকম।

ঘর সুদ্ধ লোক এসে হাজির, হন্তদন্ত টিকিধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাও উপস্থিত— বলা যায় গোটা গ্রামটাই আমাদের দরজায় এসে ভেঙে পড়ল। কেউ কেউ হাঁটুতে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন, কেউ হুমড়ি খেলেন। কেউ-বা থুবু হয়ে বসে পড়লেন সামনের দিকে। কথঞ্চিৎ বঙ্কিম কোমর, কেউ কেউ ঘাড়টা লম্বা করে দিলেন বকের মতো। আর কেউ দৌড়তে দৌড়তে এসে— ''এই সরো, সরো, দেখি দেখি''— বলতে বলতে যেখানে ছুঁচ ঢুকত না সেখানে ফাল হয়ে ঢুকে পড়লেন। ঢুকলেন মানে? ওই যে খাড়া হয়ে একবার দাঁড়িয়ে গেলেন, সহজে আর নড়লেন না! বিচার-বিশ্লেষণ চলতে লাগল, টিকিধারী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের টিকিটাও নড়ে চলল সমানে। এই করে আলোচনা যখন একেবারে তুঙ্গে, আমার অধমের অধম গুজরী যে কী না আন্দাজ উইপোকাগোছের একটা কিছু হবে, সে পুট করে বলে বসল, ''এঃ যার এত খিদা, যে গোটা একটা মোষ খায় মানুষ খায়—তার অত ছোট ছোট পা?'' বলেই সে অর্ধেক উঠেছিল, আমাদের ছোটকাকা চাঁটি মেরে পুরোপুরি বসিয়ে দিলেন তাকে— ''বসে পড় উল্লু কাঁহাকা!'' এই রে ছোটকাকাও হিন্দি বাত! নিশ্চিত মেজোকাকার রোগে ধরেছে তাঁকে! পুনরায় বালির আস্তরণের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখি— তিন তিনটে পায়ের ছাপ। চিহ্নিত, মুদ্রিত, ভয় খচিত ত্রিপাদ! ভরসা যা এই—তিনটে পা-ই বর্হিমুখী, স্পষ্টচিহ্নিত বর্হিগমন!